বিজন ভট্টাচার্যের নাটকে সঙ্গীতের ব্যবহার

ড. নন্দিনী বন্দ্যোপাধ্যায় দে

সময়টা ছিল বড়ই অস্থির। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিশাপ ছড়িয়ে পড়েছিল সারা পৃথিবীতে। ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশ রেহাই পায়নি তার বিষবাষ্প থেকে। বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সাথে ভারতের ভাগ্য সরাসরি জড়িয়ে গেল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যোগদানকারী সৈন্যদের জন্য খাদ্যসরবরাহ করতে গিয়ে শাসক ব্রিটিশ এবার হাত বাড়াল ভারতবাসীর শস্যভাণ্ডারের দিকে। মিরজাফররা তো চিরদিনই সক্রিয় থাকে—দেশীয় জোতদার, পুঁজিপতি, মহাজনদের সহায়তাকে শ্রীঘ্রই বাজার থেকে উধাও হয়ে গেল চাল ডাল। দেশব্যাপী দেখা দিল এক মহা দুর্ভিক্ষ (১৯৪৩)। বাংলার শস্য শ্যামল গ্রাম শ্মশানে পরিণত হল। পাশাপাশি শুরু হল প্রাকৃতিক দুর্যোগ — বন্যা, মহামারি। ওদিকে মহাত্মা গান্ধি ডাক দিয়েছেন মরণপণ শেষ সংগ্রাম 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন' (১৯৪২) -এর। ব্রিটিশও সব শক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে আন্দোলন প্রতিহত করবার জন্য। বিজন ভট্টাচার্যের ভাষায়—''সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের অনিবার্য অভিশাপ ধুরন্ধর ধন্বন্তরীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে শেষ পর্যন্ত গোটা দেশটাকে ভাসানো ভেলায় জলাঞ্জলি দিয়েছে দুঃখ নিরাশার অথই পাথারে। আর উথাল-পাথাল সেই বিশাল পরিধির তট প্রান্তে আমরা দেখেছি দুখিনি জননী মা সনকাকে, শতচ্ছিন্ন বসনে অধীর আগ্রহে সেই ভাসানো ভেলার প্রতীক্ষা করেছেন!...

তাই গান্ধিজি প্রবর্তিত Do or die আগস্ট বিপ্লবে যে মা সনকাকে দেখেছি মেদিনীপুরে, সেই মা-কেই দেখেছি পঞ্চাশ সালের মন্বন্তরে কলকাতার রাস্তায় বাটি হাতে কাঁদতে। দাঙ্গার সময় সেই মায়েরই দেখেছি ছিন্নমস্তা রূপ। নিজের রুধির নিজেই পান করে বলাধান করে নিচ্ছেন মা। কাঁখে কোলে মা ষষ্ঠীর দান সেই মা- কেই দেখেছি বাস্তু হারিয়ে বসেছেন দেশঘর ফেলে শিয়ালদহ স্টেশনে। পরনে ছিন্নবাস, আলুথালু বেশ—স্বামীপুত্র খেয়ে ক্ষুধার্ত মায়ের তখনও আকণ্ঠ ভরে আছে।"

অন্যদিকে মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা থেকে যে শুভবোধ জাগ্রত হল তার ফলে দীর্ঘ অপেক্ষার অবসানে ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির আইনি বৈধতা ঘোষিত হল। যা বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনে সমাজ চৈতন্যবোধের জাগরণ ঘটাল। বিজন ভট্টাচার্যের ভাষায়—''একটা গণতান্ত্রিক জীবনবোধ ন্যাশনাল সোশ্যালিজ্‌ম বা ফ্যাসিস্ট তন্ত্রের সঙ্গে পরোক্ষভাবে মোকাবিলা করতে গিয়ে অনুন্নত এই উপনিবেশেও মূর্ত হয়ে উঠল নবজীবনের সজীবতা। দৃষ্টিকোণে এল ডায়ালেক্টিক বাদ।" একদিকে দুঃখিনী মা কে সান্ত্বনা দিয়ে জানানো 'ভরসা রাখো, আমরা তোমার সোনার বেহুলা লখীন্দরকে ফিরিয়ে এনে দেব।' অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শের সম্মেলনে জন্ম নিল 'ফ্যাসি বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' (১৯৪২) ও তারই শাখাস্বরূপ 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ (মে, ১৯৪৩)। এই গণনাট্য সংঘেরই সক্রিয় কর্মী শিল্পীরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য।

'গণনাট্য সংঘে'র নামকরণে যেমন নাটক নামক শিল্পাঙ্গিকটি এর সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে থাকার স্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে তেমনি গানও কিন্তু 'গণনাট্য সংঘে'র আন্দোলন তথা কর্মকাণ্ডের প্রধান অঙ্গ ছিল। সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশার কথা গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দিয়ে তাদের মধ্যে জনজাগরণের মন্ত্রের উদ্‌বোধন এই নাটক আর গানের উদ্দেশ্য। গান জাগায় প্রাণকে। বিজন ভট্টাচার্য গণনাট্য সংঘের কর্মীদের উল্লেখই করেছেন 'চারণ' বলে, বলেছেন, —''মা সনকার সেই নিদারুণ দুঃখবেদনার কাহিনি ধন্বন্তরীদের আশেপাশে থেকে চারণ হিসেবে রূপ দিয়ে আসছিলাম আমরা, অর্থাৎ গণনাট্য সংঘের কর্মীরা, বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালাকাল থেকে।" তিনি আরো লিখেছেন — ''রাত এগারোটার পর সংঘের কাজকর্ম শেষ করে আমরা যখন শেষ ট্রামে বাড়ি ফিরতাম, গণনাট্য সংঘের সব জঙ্গি গান গাইতে - গাইতে, তাতে যোগ দিতে কবি অরুণ মিত্র, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, সুভাষ তো থাকবেই, ছিল জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, শম্ভু মিত্র এবং আরও অনেকে। অনেক দিন ট্রাম কনডাক্টাররাও আমাদের সুরে সুরে মেলাতেন। সমবেত সংগীতে সবারই সমান অধিকার ছিল। বিনয় রায়, হারীন চট্টোপাধ্যায়, বিশেষ করে বন্ধু জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের 'নবজীবনের গান' তখন সারা বাংলাদেশে কোরাস সংগীতে এক নতুন প্রাণশক্তি জোয়ার এনেছিল।" এ হেন গণনাট্য সংঘের শরিক হিসাবে বিজন ভট্টাচার্যের নাটকে যে গান আসবে তাতে আর আশ্চর্য কী? তাই তো 'নবান্ন' নাটকে ওই দুর্দিনের পটভূমিতেও গান এল, লেখা হল গীতিনাট্য 'জীয়নকন্যা'। বাউল - জীবন নিয়ে লেখা নাটক 'মরাচাঁদ' কিংবা 'দেবীগর্জন', 'গর্ভবতী জননী' -তে যুক্ত হল একাধিক গান।

তবে শুধুমাত্র গণনাট্য সংঘের ঐতিহ্য থেকেই বিজন ভট্টাচার্যের নাটকে গান সংযুক্ত হয়েছে একথা মনে করা একেবারেই ভুল। কারণ গান ছিল বিজনের রক্তে। সারাজীবন ঘুরে বেড়িয়েছেন গ্রামে গ্রামে। অকুণ্ঠভাবে মিশেছেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে, আউল বাউলের আখড়া, বৈষ্ণবের মঠ, সাপুড়েদের ডেরা, টুনে কিংবা মালোদের পাড়ায় পাড়ায় অনেক ঘুরেছেন তিনি। কলকাতায় এসে থিতু হওয়ার আগে এইসব করেছেন তিনি। আবিষ্কার করেছেন অন্ধ বাউল টগর অধিকারীকে। সাপুড়েদের সঙ্গে দিনের পর দিন ঘুরে সাপধরা, সাপের বিষ ঝাড়া, সাপ খেলানো ইত্যাদি বিষয়গুলিকে নজর করেছেন, আয়ত্ত করেছেন তাদের নিজস্ব সব সুর। তাঁর নিজের ভাষাতে, —''টগর অধিকারী একটা টগর অধিকারী নয়, তার পিছনে কুড়িটা টগর অধিকারী ছিল। তাদেরও আমি চিনতাম। পরিণত বয়সে I came into contact with টগর অধিকারী। তার আগেও বহু আউল বাউলের সঙ্গে আমার দিনের পর দিন contact হত এবং তাদের এই একই life, একই faith, একই রকম চলন, একই রকম বলন...এই ফকির - আউল- বাউল সম্প্রদায়ের সঙ্গে ছোটোবেলা থেকেই মিশতাম, তাদের গান শুনতাম, আখড়ায় যেতাম, থাকতাম, গান শিখতাম, আবার ratify করতাম, তারাও আসত। বৈষ্ণব বৈষ্ণবীর আখড়ায় গিয়ে তারা কী করে, সব দেখতাম।" সুতরাং তাঁর সৃষ্ট নাটকে, বিশেষত যে নাটক এই মাটির মানুষদের নিয়ে লেখা সেখানে যে গান আসবে সে তো স্বাভাবিক, বিশেষত আমরা একটু লক্ষ্য করলেই দেখব বিজন ভট্টাচার্য তাঁর নাটকে যে সব গান ব্যবহার করেছেন তার অধিকাংশই লোকসংগীত পর্যায়ভুক্ত। মাটির গন্ধ মাখা সেই সব গান তাঁর নাটককে অন্যমাত্রা দিয়েছে।

'নবান্ন'ই (১৯৪৪) বিজন ভট্টাচার্যকে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়তা দিয়েছে সন্দেহ নেই। 'নবান্ন' দিয়েই শুরু করি। 'নবান্ন' নাটকে গান এসেছে নাটকের প্রায় শেষের দিকে – চতুর্থ অঙ্কে। তখন 'নবান্নের' আকাশ থেকে সরে গিয়েছে সব ঝোড়ো মেঘ। ওই বুঝি নতুন দিনের সূর্য উঁকি মারছে। নিরঞ্জন খুঁজে পেয়েছে তার বউ বিনোদিনীকে। গ্রামে ফিরে নতুন করে সংসার শুরু হয়েছে। কিন্তু মনের মধ্যে

আজো যে জেগে ওঠে শঙ্কা। সত্যিই আসবে তো নতুন দিন। তার গানে ফুটে ওঠে এই সব কথা—

বড় জ্বালা বিষম জ্বালায়
পুড়ে পুড়ে সব সোনা,
সে কথা তো মিথ্যে হল
হলাম অনুপায়।
দুখের দান সুখের আসন
বিজ্ঞজনের হক্‌কথা
শুনে এলাম এই তথ্য
চলতি পথের একতারায়
হলাম নিরুপায়।

গানের প্রথম অংশে ব্যক্ত হয় এ সময়ের হতভাগ্য মানুষের বুকফাটা হাহাকার। শেষ 'দুখের দাহন' শেষ 'সুখের আসনে'র আশ্বাসে সর্বহারা মানুষের মনে আলো ছড়ায়। 'চলতি পথের একতারা' শব্দগুচ্ছ গানটিতে ছড়িয়ে দেয় লোকায়ত অনুষঙ্গ। চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের গানটি স্পষ্টই একটি লোকসংগীত। ফকিরের এই গানে একদিকে উঠে আসে বিগত দিনের মর্মন্তুদ ইতিহাস অনদিকে ভাবীকালের প্রতি সতর্কতার বাণী — আর যেন এমনটি না হয়। এই গানে নাট্যকার গণনাট্যর মধ্যে দিয়ে লোকশিক্ষার কাজটি সেরে রাখেন, নিজের বক্তব্যও যেন সেখানে মিশিয়ে দেন। ফেলে আসা ভংয়কর দিনের চিত্র ধরা পড়ে ফকিরের গানে,—

'কালান্ত আকালে এমন কত চাষি ভাই।
অকালে যে প্রাণ হারাইল লেখা জোখা নাই'
কিংবা বালবাচ্চা কচি শিশু দুধ না পাইয়া মরে
জননী প্রেতিনী হইল বুকে রক্ত ঝরে।

এরকম বহু চিত্র ধরা পড়ে ফকিরের গানে। কিন্তু আর নয়— এই দিন থেকে আমরা যে শিক্ষা পেলাম তাকে এবার কাজে লাগাতে হবে—

এ জীবনের প্রহসনে কী বা বল ফল।
বাঁচিবারে যদি চাও মনে আনো বল।
আসন - ফসল শুভ লক্ষণ প্রতি ঘরে ঘরে।
গাঁতায় খাটিয়া তোলো মিলি পরস্পরে।

এভাবেই একদিন সুদিন আসে। চাষিদের মিলিত প্রয়াসে বাংলার মাঠ সবুজ ফসলে ভরে যায়, ঘরে ঘরে ফিরে আসে হাসি - আনন্দ - উৎসব। নবান্নের ঘ্রাণে উড়ে আসে পাখির দল। শ্রীহীন নারীকুল আবার সৌন্দর্য সম্পদে ভরে উঠবে এই কামনায় নানা আবদার জানাতে চায় তাদের স্বামী অথবা প্রেমিককে। নবান্নের শেষ গানে সেই সোনার বাংলার আসন্ন উদ্ভাস—

নিসলো চেয়ে সামনের হাটে গলার হাঁসুলি
ডুরে শাড়ি পাছা পাড় আর হার সাতনলি।
কনে দেখা আলো মেখে আসবে বধূঁ আল বেয়ে
দেখে হেসে সরে যাবি কথা না কয়ে।

আমাদের পরবর্তী আলোচ্য বিজন ভট্টাচার্যের একমাত্র গীতিনাট্য 'জীয়নকন্যা' (১৯৪৫-৪৭) নাটকটি। গানের আলোচনায় গীতিনাট্য প্রসঙ্গ আসবে একাটা স্বাভাবিক। কিন্তু 'জীয়নকন্যা' শুধু একটি গীতিনাট্য নয়, তার চেয়ে বেশি কিছু — গানই সেখানে প্রাণদায়ী শক্তি। যাই হোক, নাট্যকার নিজে কি বলছেন দেখা যাক। তিনি বলছেন, —''জীয়নকন্যার construction -এআমার সুর ধরে কথা এসেছে, কথা ধরে সুর এসেছে।'' সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে এ নাটকের মূল সুরটাই গানে বাঁধা। 'জীয়নকন্যা' নাটকের বিষয় এবং আঙ্গিক দূয়ের ক্ষেত্রেই গান যথোপযুক্ত ভাবে প্রযোজ্য। 'জীয়নকন্যা' আসলে বেদেদের কাহিনি। এই সাপুড়ে বা বেদেদের সাথে কীভাবে একসময় মেলামেশা করেছিলেন নাট্যকার তা তাঁর ভাষাতেই জানাই, — ''বীরভূম - বাঁকুড়া অঞ্চলের কিছু মানুষের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, সেখানে বংশানুক্রমিক কিছু লোক আছেন যাঁরা সাপটাকে চেনেন, সাপ সম্পর্কে বলে দিতে পারেন, সাপের species কী, genus কী, কী থেকে species পর্যন্ত তার division, কত রকম সাপ আছে, কোন সাপ কোন ঘরানার সাপ, তারা সব জানে। একপক্ষ কালের মধ্যে কোন সাপ বিষের থলিতে কত বিষ acquire করে, সেটাকে মুখে কামড়াতে হলে কতখানি মুনশিয়ানা লাগে, কতটা বিষ তোলা যেতে পারে, তার মোটামুটি হিসেব তারা জানে।'' এদের সাথে মিশে বিজন ভট্টাচার্য বুঝেছেন, —''ওরা কতগুলো jargon use করে, এখন সেগুলো traditional, আমরা এগুলো scientifically সব সময়ে পরীক্ষা করিনা, গান করে, মন্ত্র টন্ত্র বলে, সবই চলে, এখানে একটা ধ্বনি তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। এখন সেখানে কোন ধ্বনি তরঙ্গ কোনো শ্বাপদের কানে কী reaction সৃষ্টি করেছে , that is known to us. দেখেছি যে তারা করে। তারা করে এবং they become successful.'' এরই ফলশ্রুতি 'জীয়নকন্যা'।

জীয়নকন্যার কাহিনি অংশ এমন। বেদেদের গ্রাম নন্দনপুর। এই বেদেদেরই সর্দার প্রবীরের একমাত্র অবিবাহিতা কন্যা উলুপী মন্দিরে পুজো দিতে এসেছে। এমন সময় পুজা বেদীর পাশ থেকে এক বিরাট আকার সাপ উঠে এসে ফণা বিস্তার করে ছোবল মারল উলুপীর হাতে। বিষের যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠল উলুপী এবং তারপরে ঢলে পড়ল মৃত্যুর কোলে। তার সহচরীরা আর্তনাদ করে ছুটতে লাগল দিগ্‌বিদিকে। সংবাদ পেয়ে উলুপীর মা কলাবতী এসে আছড়ে পড়লেন কন্যার বুকের উপর। তিনি গাইলেন—

নাগরাজ ফণী দংশিয়াছে শুনি
আমার সোনার উলুপীরে

দেখ সোনার অঙ্গ ধরিল কি কলঙ্ক
না জানি কি ভুজঙ্গ কালান্ত রে

প্রবীর গাইলেন,—

হেই দারুণ বিধি কোন কারণে সুধি
খাইলি পরাণ পুতলিরে।

স্বাভাবিক ভাবেই এই গানে সন্তান হারা পিতা মাতার চিরন্তন শোকোচ্ছাস ধরা পড়েছে পাড়া প্রতিবেশীরাও তাঁদের অশ্রুতে অশ্রু মিলিয়ে গেছেন—

কলাবতী গো মা, ওমা শুনে যে হায় প্রাণ বিদরে
নন্দনপুর ছায়া অন্ধকারে
কোন সে ফণী খাইল চাঁদেরে

প্রাথমিক শোকোচ্ছাস কাটিয়ে উঠে শক্ত হন প্রবীর। না, বিধাতার কাছে তিনি কন্যার প্রাণ ভিক্ষা চাইবেন না কিছুতেই। তার চরিত্রের পরে চাঁদসদাগরের ছায়া। তার গানে ধরা পড়ে সেই পুরুষোচিত দৃঢ়তা,—

নহে ভিক্ষা নহে ভিক্ষা নহে ভিক্ষা
ভিক্ষায় না মিলিবে প্রাণ,
ভিক্ষায় হবে অপমান।

কিন্তু মায়ের প্রাণ তো অত শক্ত নয়। সনকার আর্তনাদে যেমন একদিন কেঁদেছিল গোটা চন্দনপুর তেমনি আর্তনাদ করেন কলাবতী। কলাবতীর গানে সার্থক ভাবেই নাট্যকার সে হাহাকার ফুটিয়েছেন,—

''কন্যা আমার চোখের মণি কন্যা আমার প্রাণ
বড়ো গলায় বলতাম তাই গঞ্জনা এমন।।
মাতা সে মরিয়া গেছে উলুপী জননী।
জীয়ন্ত আছে গো শুধু জননী প্রেতিনী।

এই হাহাকারে কেঁদে ওঠে গোটা নন্দনপুর। কিন্তু নন্দনপুর শুধু কাঁদেই না, নন্দনপুরবাসী কলাবতীকে জানিয়ে দেয়,—

(মাগো) জীয়াইব তোর সন্তানে,
(মাগো) বাঁচাইব তোর সন্তানে,
আমরা হলাম বেদের জাত মা
মহারণ্য মাঝে।
কালসর্প এমন নাই কোন
ওষুধ এড়াই গিছে।

কথা রাখে নন্দনপুর। যেখানে পড়ে আছে উলুপীর বিষ জর্জরিত শরীর সেখানে এসে জড়ো হয় যত বেদের দল। রঘুপতি এদের প্রধান। তার নির্দেশে শুরু হয় দেবদেবীর বন্দনা। সাধারণত গ্রামে গ্রামে মনসার পালা গাওয়ার সময় এই বন্দনা দিয়েই শুরু করা হয়। বিজন ভট্টাচার্য নাটকটিতে এরপর বিষ ছাড়ার যাবতীয় বর্ণনা একেবারে মাটির অভিজ্ঞতা থেকে এনেছেন। বন্দনা অংশে গাওয়া হল,—

বন্ধনে বন্ধন বান্দি গো
উত্তর শিয়রি মৈনাক চূড়া
একরাশ চুল তার মাথা হুড়া,
উড়াইয়া দেও চুল গোধূম পাহাড়ে
ঘাড় মোটা কানা বাজ খাড়া কর বাঘারে।।''

এই ভাবেই গানে গানে বন্দনা গেয়ে বাঁধন দেওয়া হল সর্প দংশিত স্থানে। ধুয়া হিসেবে বারবার ফিরে আসে এই ধরনের সমবেত বেদেদের গান আর মাঝে মাঝে রঘুপতি বলে চলে বিষ ঝাড়ার মন্ত্র—

ওপার ধুপি কাপড় কাচে
পদ্মের পাতায় বিষ ভাসে,
ওলো ধূপি তুই গুরু মুই শিষ

অঞ্চলেতে বান্ধিলাম উল্‌পীর অঙ্গের কালকুটি বিষ। এভাবেই গানে - মন্ত্রে এগিয়ে চলে বিষ ঝাড়ার আয়োজন। গণপতি নামক আর এক বেদেও ছড়া কাটে,—

সমুদ্দুরের কালো জল দেখে লাগে ভয়।
কালীদহের স্মরণে বিষ যায় মুখে আয়।
(ঝাড়ান দেয়)

বেরোরে কালকুটি বোড়ারি বিষ, স—ফুং। কিন্তু কিছুতেই বিষ নামে না উলুপীর। সমবেত বেদেরা সিদ্ধান্ত নেয় 'বিষ ঝিসাইয়া গেছে মগজে।' মগজে বিষ চলে গেলে আর বাঁচান কঠিন। বিঝ ঝাড়ার শেষ অস্ত্র 'চালান' দিতে প্রস্তুত হয় বেদের দল। সমবেত বেদে বেদেনি গান ধরে,—

হারে গো আয় কালনাগিনির নাতিন জামাই
এ দারুণ বিষের বিষম ভারান।
জয় কালীর গি দে দ্যাও যে চালান।
ওরে ডোরা - কাটা লাল রক্ত - কানড়।
নীলনয়নী আয় তো পাথুড়ে - কানড়।।
বিষদন্তী ডরে কালনাগিনি।

গণপতি, রঘুপতি বিষ ঝাড়াই মন্ত্র পড়ে। বেদে বেদেনির গান চলে কিন্তু কোনো ফল হয় না। গণপতিরা শেষ চেষ্টা করতে থাকে। বেদেরা গান গায়,—

স্বর্গ মর্ত রসাতল
তিন থাক
তিন ফাঁকে,
গড় করি তোর চরণতল;
হরা।

বেদেনিরা গান গায়,—

নীল নদের খালখন্দ রে
উগারি দে
উগারি দে তারে।

সব প্রচেষ্টা যখন নিষ্ফল হয় বদর আলি নামক এক তরুণ বেদে উঠে আসে, সে নিবেদন করে যে পুরোনো মন্ত্রগুলি বুঝি শক্তি হারিয়াছে, এখন নতুন মন্ত্র বলতে হবে। যে তার গুরু লক্ষ্মণেশ্বরের কাছ থেকে শিখে এসেছে মন্ত্র। সে সেগুলি বলতে চায়। সমবেত বেদেদের সম্মতিতে সে শুরু করে অরণ - ভরণ নামক নতুন মন্ত্র। এ মন্ত্রের বিষয় বেহুলার কাহিনি। যার আত্মবলিদানে কেঁপে উঠেছিল দেবতার আসন তাঁকেই এবার স্মরণ করা হল। —পাশাপাশি চলল চালান চাপান। আরণ - ভরণের গাণে—

আরণ ভরণ কুলোখানি রে
বক ফুলের মলা,
(হারে) বেউলো সতী চরণ বরে
বাসে হলে মাঞ্জা,
রে বিধির কী হইল।

চালান চাপানের গান,—

জটি লা কুটিলার মাথার জট্ খোল।
কালকুটি চিবায়া খা লে বেদিনি।।
অসাধ্য সাধনে সাধি সাধ লো।
বিশল্যকরণী দে লো পরাণী
কুর কুর্, ড্যাং না ড্যাড্যাং...

রঘুপতি গাইল,—

যখন গোঁসাই আমি মথন মথিল
ও বিষ যা যা
বিষ খেয়ে মহাদেব ঢলিয়া পড়িল
বিষ যা যা।

এইবার সেই প্রত্যাশিত মুহূর্ত । সোঁ সোঁ শব্দে সমস্ত পরিবেশ আচ্ছন্ন করে দেখা দিল বিরাটাকার সেই সাপ (মানুষরূপী)। সারাদেহ ফুঁসছে তার জিঘাংসায়। সমগ্র শক্তি দিয়ে গান গাইল, মন্ত্র পড়তে বেদে রা। আগম্ আগম্ বোম বোম শব্দে মন্ত্রে - নৃত্যে মুখরিত হয়ে উঠল দশদিক। বদর আলি তার গানে সাপকে নির্দেশ পাঠাল,—

এ এব ছাড়ি রঙ্গ রে ভুজঙ্গ
বিষ তোল হে সুন্দরীর।
ঠেকারি ঠেকার ছাড়
জানো দড় আছে রঘুবীর।

অবশেষে হার মানে সেই সাপ। নাট্যকার সাপকে দিয়েও গান করিয়ে নিয়েছেন এই নাটকে। বশ মেনে সাপ গান গেয়েছে,—

দেশটি বেদের ছিল ভালো
এখন যেন কেমন হলো।
বিষম বাঁধন ছাড়ান পেলে
রাজ্য ছেড়ে যাবো চলে।
সুখের মুখে পড়ল ছাই

আমারহ কেনে মরণ নাই।

এরপর সাপ তুলে নিয়েছে তার বিষ। নতুন জীবন ফিরে পেয়েছে 'জীয়নকন্যা', গানে গানেই এই নাটকের শুরু, পরিণতি এবং সমাপ্তি। জীয়নকন্যার গানগুলির স্বরলিপিও প্রকাশিত হয়েছে। বিষয়ের সাথে চমৎকার মিশে গিয়েছে গান এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে উঠে আসা বলে তার ভাব ভাষা অসাধারণ বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করেছে — এখানেই নাট্যকারের কৃতিত্ব।

পরবর্তী যে নাটকটির গান বিষয়ে আমরা আলোচনা করব সেটির নাম 'মরাচাঁদ' (১৯৪৬)। এটি জীয়নকন্যার ঠিক পরেই রচিত। নাটকটি পড়লেই বোঝা যাবে নাট্যকারের বুকের মধ্যে এখনো বয়ে চলেছে সুরের প্রবাহ। কারণ মরাচাঁদের নায়ক একজন বাউল, যিনি অন্ধ, সুতরাং যে নাটকের প্রদান চরিত্র বাউল সেখানে যে গান থাকবে সে তো খুবই স্বাভাবিক। আমরা পূর্বে আউল বাউলের সঙ্গে লেখকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং জনৈক টগর অধিকারী নামক বাউলের সাথে তাঁর পরিচয় ইত্যাদির কথা উল্লেখ করেছি। এই টগর অধিকারীর জীবনেরই ছায়াপাত ঘটেছে। মরাচাঁদে। নাটকের ভূমিকাতে নাট্যকার জানিয়েছেন টগর অধিকারীর জীবনের কিছু কথা। একদিন গান - নাটকের এক মহড়ায় টগর অধিকারী নাট্যকারকে জানান তিনি একটি সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করতে চান কিন্তু প্রয়োজনীয় টাকা নেই বলে করতে পারছেন না। একদিন 'নবান্ন'র অভিনয় শেষে নাট্যকার সমবেত দর্শকের কাছে ঘোষণা করেন টগরের মনোবাঞ্ছা। দর্শকরা তাদের সামান্য অর্থ দিয়ে ভরিয়ে দেয় নাট্যকারের তথা টগরের ঝুলি —অকুণ্ঠশ্রদ্ধায় ভালোবাসায়। তারপর? —''টগর বিয়েও একটা করেছিল উত্তরবঙ্গেরই পল্লিগ্রামের একটি সুন্দরী মেয়ে। সংসারও একটা পেতেছিল দোতারা সম্বল করে। কিন্তু টগর অধিকারীর সুখের সংসার বেশিদিন টেকেনি। সুন্দরী বউটি কোনো এক কপট প্রেমিকের ছলনায় টগরকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল।... সংক্ষিপ্তভাবে অন্ধ দোতারা বাদক টগর অধিকারীর জীবন কাহিনিই মরাচাঁদ নাটকের আখ্যান বস্তু।'' সুতরাং এ নাটকে গান এসেছে অনিবার্যভাবে— এসেছে বাঁধ ভাঙা বন্যার মতো। সুখদুঃখ ভরা বাউল জীবন — দোতারা - গানকে আশ্চর্য দক্ষতায় একাকার করে দিয়েছেন লেখক।

নাটকের সূত্রপাতেই দেখি পূর্ণিমার রাতে বসেছে বাউলের মেলা। জ্যোৎস্নাধোয়া প্রকৃতিতে গানের ঢল নেমেছে সমবেত বাউলের মনে। আর সেই বাউলদের মধ্যমণি, এ নাটকের নায়ক অন্ধ বাউল পবন বৈরাগী। গানে গানে নিজেকে উজাড় করে দিচ্ছে সে — গানের ভেতর দিয়েই তো সে চিনতে চাইছে অরূপ স্রষ্টাকে,—

তুমি তো নও অরূপ রতন
শিব সনাতন,
আমি তোমায় চিনি গো জানি গো।
বুক পাঁজরে আগুন জ্বেলে,
জ্যান্তে মরণ কর বরণ।
আমি তোমায় চিনি গো জানি গো।

এই স্রষ্টা শুধু সৃষ্টির আড়ালেই বসে থাকেন না, পবন তাঁর গানে জানিয়ে দেন,—

জান্ দিয়ে ধান গোলায় তোল
জেল হাজতে বাসর জাগো,
আমি তোমায় চিনি গো জানি গো।

অর্থাৎ তিনি অরূপ, মানুষের মধ্যেই তার রূপের প্রকাশ। পবন শুধু গানই গায় না, ব্যাখ্যা দেয় তার গানের সহজ সরল ভাষায়, — ''সেই নিরাকার পরব্রহ্ম যাঁর কোনো রূপ নেই গুণ নেই,—রসরূপের রাজ্যে যিনি নির্গুণ, সেই নির্গুণ ব্রহ্মের বদলে আমি দেহধারী জীব মানুষকে পিতিষ্ঠে দেলাম; কেন কি এই তুমি, আমি, এই মানুষ, অখণ্ড নির্গুণ সেই ব্রহ্মেরই অংশবিশেষ।'' ব্যাখ্যা শেষে আবার শুরু হয় গান — এক সময় শেষ হয় গানের রাত। সকালবেলায় পবনের কথায় বোঝা যায় সে গোঁসাই (কেদতদাস কীর্ত্তনীয়া)-এর আখড়ার সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করতে চায়। শচীনবাবু নামক এক কৃষকদরদি ভদ্রলোক পবনের ঘনিষ্ঠ জন। তিনি গানের মাধ্যমে লোকশিক্ষার জন্য পবনের গানকে মাধ্যম করতে চান। পবন রাজি হয়। কিন্তু এ গান গেয়ে পয়সা পাওয়া যাবে না। অথচ গান গেয়ে ভিক্ষান্ন জোগাড় করে সংসার চালানোই পবনের জীবিকা। কিন্তু সে গোঁসাইয়ের আখড়ায় যাওয়া বন্ধ করেছে তার শিল্পী সত্তার সেখানে অপমান হচ্ছে বলে। এদিকে সংসারে তার স্ত্রী এবং মাসি অভাবের জন্য নিত্য গঞ্জনা দেয় পবনকে। মাসি বলে, —'পোড়া সংসারের মুখও আছে, খাওযাও আছে, নেই শুধু তার ব্যবস্থা। পদ নচা হচ্ছে। ঘরে আগুন দে বাইরি আনন্দ করে বেড়াবার কি যে মাহ, তা-ও বুঝতে পারিনি।'

পবনের স্ত্রী রাধা বিদ্রুপের সুরে বলেন, —''কি করবে বল? আয়েন গায়েনের জাত। মানসীর দুঃখকষ্ট ওদের গায়ে লাগে না।'' এই অবস্তায় 'মনসার ওপর ধুনোর গন্ধ' দিতে আসে কেতক দাসের অনুচর ভোলা। সে রাধাকে জানিয়ে যায় গোঁসাই বলছিলেন, —''ওই রূপ, ওই গুণ, ওই কণ্ঠ পবনের হাতে পড়ে... তা যেও।'' গোঁসাই - এর আঙিনা থেকে ভেসে আসে কীর্তনের সুর সেই সাথে অনেক কিছুরই আহ্বান — রাধার মন সেদিকেই ছুটে যেতে চায়।

ওদিকে কেতকানন্দের আখড়ায় গান শুরু হয়েছে। প্রথমে, জনৈক বৈষ্ণবের কণ্ঠে — একখানি গান রেখেছেন নাট্যকার। এইট বাৎসল্য রসসিক্ত বাল্যলীলার গান। মা যশোদা কৃষ্ণকে গোটে পাঠাতে ভয় পাচ্ছেনা। তাঁর সেই আকুলতাটুকু চমৎকার ফুটিয়েছেন নাট্যকার, —

ও বলরাম ফিরে যা তোর গৃহেতে
নীলমণিধন নিবে না মায় - গোষ্ঠেতে
... ...
যখন রৌদ্রে উঠবে তাপ
অঙ্গে চুয়াইবে ঘাম রে বলাই নবঘনশ্যাম
ওকে অঞ্চলেতে ঘাম মুছাইবে

ওকে টেনে নেবে কোলেতে,
নীলমণিধন দিবে না মা-য় গোষ্ঠেতে।

নয়নতারা নামক বৈষ্ণবী গায় আক্ষেপানুরাগ জাতীয় একটি গান। ভনিতায় 'রাধারমনে'র নাম, সে গানে শ্যামের বাঁশিও পীরিতি যে হৃদয় লুণ্ঠন করে জীবন্ত মানুষকে মৃত করে দেয় তারই বর্ণনা,—

প্রেম কোরো না তোমরা সবে গো
আমি প্রেম করিয়ে
হইলাম জীতে মরা গো;
ধ্বনি কি শুনিলাম কানে।

এরপর আসরে নামেন কেতকানন্দন, প্রেমের গভীরতত্ত্ব অপেক্ষা রাধার দৈহিক সৌন্দর্য বর্ণনাতেই তার বেশি আগ্রহ। যে কাম বৈষ্ণবধর্মে নিষিদ্ধ এই ভণ্ড গোঁসাইরা ধর্মের আড়ালে নানা পায়ে সেই কামকেই যে চরিতার্থ করতে চায় নাট্যকার এ নাটকে, নানাভাবে সেটি তুলে ধরতে চেয়েছেন। কেতকদাসের গানে যে সেই কামগন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। তিনি গান,—

দিনে দিনে পয়োধর ভৈ গেল পীন।
বাঢ়ল নিতম্ব মাঝ ভেল ক্ষীণ।।
... ...
কবহুঁ বান্ধয়ে কুচ কবহুঁ বিথারি।
কবহু ঝাঁপয়ে অঙ্গ কবহুঁ উঘারি,... ইত্যাদি

গাইতে গাইতে কেতকানন্দ তার গান শেষ করেন,—

শয়নেতে রাধা গমনেতে রাধা
রাধাময় হল আঁখি
স্নেহেতে রাধিকা প্রেমেতে রাধিকা
রাধিকা আরতি পাশে।

এ রাধা যে বৃন্দাবনের রাধা নয়, বপনের স্ত্রী রাধা তা অচিরেই বোঝা যায়— কেতকানন্দ তার গলার মালা ছুঁড়ে দেয় রাধার গলায়। ওদিকে পবনের গান শুনতে ভেঙে পড়ে লোক। শচীনবাবু তার অজস্র প্রশংসা করেন, কিন্তু এ গান গেয়ে তো পয়সা আসে না ঘরে। পবনের সংসারে মেঘ ঘনিয়ে আসে। মাসির গঞ্জনা চরমে ওঠে। রাধার গানেতেও পবনের বিরুদ্ধে স্পষ্ট অভিযোগের সুর। যাই হোক জনৈক বৈরাগীর 'ক -তে কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতার' গান শুনে এ হেন মাসিও গেয়েছে 'গৌর রূপ ঘরে ভোলা — নয়নতারা' গানটি।

ফিরে আসি পবনের কথায়। তার প্রাণে যে গান কিছুতেই তার স্রোত স্তব্ধ হয় না। ঘরে তার হা - অন্ন। খেতে চেয়ে খেতে পায় না পবন কিন্তু তার গলায় উঠে আসে গান। এইসব সুখ দুঃখের মালিক যিনি বাউল প্রাণ তাঁকে চিনতে চায়, —

আসি চিনি বা না চিনি তোমায়
তুমিও আমার বন্ধু।
তুমি জানিও মনে মনে।

এ গানে সে তার রাধাকে বাঁধতে চায় হৃদয় ডোরে। চাঁদের আলোয় কোকিল ডাকে, পাপিয়া ডাকে, চোখ গেল পাখি ডাকে, উড়ে যায় গাং চিলের ঝাঁক—ঘুম আসে না পবনের চোখে, তার বুকের ভেতর ডানা ঝাপটায় হাজার সুর, হাজার কথা। সে কথা সে কাকে বলতে চায় রাধাকে না অচিন বন্ধুকে কে জানে?—

আমার জন্যে কাঁদি যখন গো
সে তোমার জন্যে।
তুমি বুঝিলে না, শুনিলে না গো
ও আমি কি করি কন্যে।

আর একদিন, পৃথিবী জুড়ে মাতন জেগেছে সেদিন। ঝড়ে জলে বৃষ্টিতে সে এক ঐকতান, রাধাকে সে বলে তাকে উঠোনে রেখে আসতে, সে ভিজবে আর গান গাইবে — পবন বলে, —"পদ নচা হচ্ছে বউ। ঝম্ ঝমা ঝম্, ঝম্ ঝমা ঝম্ - নিখর্ব ছিঁটে ফোঁটা অক্ষরে পদ নচা হচ্ছে বউ। আর সেই সঙ্গে পড়তেছে মৃদঙ্গের ঘা, গুম্ গুম্, গুম্ গুম্, গুম্ গুম্" আর গান গায়, সে গান মিশে যায় মত্ত মাতাল এই পৃথিবীর সাথে,—

কালো মেঘে কৃষ্ণ ছায়া
অম্বরে ডম্বরু বাজে।
অশনি করকাপাতে
বাজাও বাঁশি মোহনীয়া।

বাস্তব জীবনেও যে ঝড় ওঠে। রাধা স্পষ্টই জানিয়ে দেয় 'পোড়া সংসারে নুড়ো জ্বেলে দিয়ে চলে যাব আমি' এবং পবনকে সে চড় পর্যন্ত মারে। চলে যায় তাকে ছেড়ে সত্যি সত্যি। পবনের কাছে রাধাই তো ছিল তার সকল সৃষ্টির প্রেরণা। তার পদ, তার গান তো রাধাময়। রাধা চলে যেতে থেমে যায় পবনের গান। তার বন্ধুরা বলে, 'মানুষটা যেন কেমন ধারা হয়ে গেছে। কথা নেই, গান নেই,' 'কথাই বলে না তার গান। একতারায় ধুলো পড়তেছে, ঘুণ ধরেছে বাঁশ কাঠিতি।' পবন এখন মরাচাঁদ। শেষে অবশ্য শচীনবাবু ইত্যাদির কথায় পবন আবার তার ভাঙা গলায় গান বেঁধেছে। নতুন করে জাগার গান। নাট্যকার সুকৌশলে এই জেগে ওঠার গানকে জনজাগরণের কাজে ব্যবহার করেছেন। সব মিলিয়ে মরাচাঁদ নাটকে গানের ব্যবহার, তার ভাব - ভাষা অত্যন্ত সুপ্রযুক্ত হয়েছে।

আর দুটি নাটকে গানের ব্যবহারের কথা বলে প্রসঙ্গে ইতি টানব। বিজন ভট্টাচার্যের 'দেবীগর্জন' (১৯৬৬)। নাটকটির পটভূমি বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের আদিবাসী বাউরি সাঁওতালদের গ্রাম। চাষবাস এদের প্রধান জীবিকা। চিরদিনই যারা মাথায় ঘাম পায়ে ফেলে সোনার ফসল ফলায় সেই ফসলে তাদের অধিকার থাকে না। জমিদারি প্রথা বিলোপের পর প্রভঞ্জন নামে এই গ্রামেরই এক ব্যক্তি বেনামিতে সমস্ত জমি দখল করে, পঞ্চায়েতি ব্যবস্থাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে গ্রামে স্বৈরাচারী শাসন শুরু করে। ফসলে ভরে উঠে তার ধর্মগোলা, চাষির ঘরে ভাতের হাহাকার। শুধু চাষির ফসলেই নয়, তার লালসা দগ্ধ করে চাষির অন্দরমহলকেও। চাষি ঘরে সুন্দরী বউ রত্না প্রভঞ্জনের খোলানে কাজ করতে গিয়ে কোথায় যেন হারিয়ে যায় তারই জৈবিক কামনা চরিতার্থ করবার জন্য। একদিন এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে মানুষ। প্রভঞ্জন কিংবা তার অনুচর মুখোশ পরা দরদি নেতা ত্রিভুবনের কথায় আর ভোলে না সাধারণ মানুষ। সঞ্চারিয়া, মংলাদের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ মানুষের বিদ্রোহের আগুনে শেষ হয় অত্যাচারের। এই হল 'দেবীগর্জন' নাটক। নাট্যকার এই নাটকে গান এনেছেন অত্যন্ত সার্থক ভাবেই, স্বাভাবিক প্রশ্ন ওঠে যে, এই ধরনের নাটকে গানের জায়গা কোথায়? আসলে যাদের নিয়ে এই নাটক তাদের জীবনে গানের একটা জায়গা আছে। বিজন ভট্টাচার্যের ভাষায়, —''কৃষির কাজ যখন কম থাকে তখন আউল - বাউল থেকে আরম্ভ করে সমস্ত artisans, লোকই গান গায়, বাজনা বাজায়, নাচ করে।...আমি যেটা দেখেছি, আমাদের সমস্ত ধ্যান ধারণা, art forms, কালচার - ফালচার, whatever it is, একেবারে pure and simple কৃষিভিত্তিক, তারা যখন গান গায়, they talk of their year's troubles তাদের লাভালাভের খতিয়ান। তারা তিন মাসের art-form- এর মধ্যে দিয়ে depict করে, unwittingly they commit themselves in these art forms, এবং এতেই লক্ষ্য করেছি যে অদ্ভুত ভাবে ধরা পড়ে তাদের সামগ্রিক জীবনের চিহ্ন।"

এ নাটকের বেশির ভাগ গান যৌথভাবে গাওয়া হয়েছে এবং পর্যায়ের দিক থেকে সবই লোকসংগীত পর্যায়ের। গানের ভাষাতেও নাট্যকার আদিবাসীদের ভাষা ব্যবহার করেছেন। নাটকের শুরুতেই রয়েছে একটি যৌথ গান যাকে কর্মসংগীত বলা চলে। বাউরি, সাঁওতাল, কুলি-কামিন ছেলেমেয়েরা ভোরের আলো ফোটার আগেই কাজে চলেছে সারবন্দি হয়ে, তাদের গলায়, —

হাতে মগের বাতি মাথাত বেতের ঝুড়ি,
চলিলাম দাদা গ পাতালপুরী।
চোখেতে ঘুম ঘুম পায়েলা রুম্‌ঝুম্‌
সুমরি শুকরি যাঁইছে পাতাল নিঝুম।

এর পরের গানটি গেয়েছে গিরি, এ গ্রামের সর্দারের বউ, তাদের একমাত্র ছেলে মংলার বিয়ের খবরে তার গলায় গান এসেছে—

করি চিরি পাটি - পারি
খৈছামে ফুল ধরি
ফুল পহেরি
তখন ভেল খবরি।

পরের গানটি আবার একটি কর্মসংগীত। প্রভঞ্জন সর্দারের খামারবাড়ির খোলানে মেয়ে কামিনরা ধান ঝাড়তে ঝাড়তে গান ধরেছে। কর্মের বোঝা লাঘব করবার জন্য তারা রঙ্গরসের গান বেঁধেছে,—

গুণের ননদ ময়না
নিশাকালে শিয়াল ডাকে
ঘরেতে মন রয় না।

এ শিয়াল যে প্রেমিক প্রবর তা আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। তার ডাকে কুলবধু কূল ভাঙতে প্রস্তুত।

নাটকের চুতুর্থ দৃশ্যে রয়েছে বিয়ের গান। বিয়ের গান বাংলাদেশের নিম্নবর্গের হিন্দুসমাজে, এবং মুসলমান সমাজে লোকাচারের একটি প্রধান অঙ্গ। নাট্যকার এই লোকায়ত বিষয়টিকে অতি সুন্দরভাবে তুলে নিয়েছেন নাটকে। মংলা বিয়ে করে বউ নিয়ে এসেছে, সমবেত মেয়েরা গান জুড়েছে — রাম সীতার বিয়ের গানের অনুষঙ্গে তারা গেয়েছে,—

সাজ সীতা সাজ সীতা সুন্দর সাজে,
সাজ রামা সাজ রামা সুন্দর সাজে।

পরের গানটি গেয়েছে রত্নার সখী রত্নাকে উদ্দেশ্য করে। বেশি ভালোবাসলে বুঝি সুখী মানুষের মনেও এক অজানা ব্যথা জমা হয়, ভালোবাসা হারানোর ভয়ে প্রাণ কেঁদে ওঠে, রত্নার। তার সখী সান্ত্বনা দিয়ে গান শোনায়,—

ই মেয়েধো নায় না,
ই মেয়েধো খায় না,
ই মেয়ের হঁইয়াছে কী?
ই মেয়ে বাঁধে লনা চুল,
পরে না দুল,
ই মেয়ের হঁইয়াছে কী?

নাটকের একেবারে শেষে পৌঁছে দেখি প্রবীন দশরথ বাউরির নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হয়েছে মানুষ, তাদের ক্রোধের আগুনে পুড়েছে প্রভঞ্জনের ঘরবাড়ি। বহুরূপীর দল বেরিয়েছে গ্রামের রাস্তায়, দশরথ তাদের মাথায় রক্ততিলক পরিয়ে দিয়ে তাদেরকেও প্রভঞ্জনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সামিল করেছে। তারা গান গেয়েছে দেবী মা-এর বোধনের গান, তাঁকে আহ্বান করে জাগানোর গান এবার দেবী জাগবেন, বিনাশ হবে অত্যাচারী —এটাই তো দেবীগর্জন,—

মাকে আন্‌তে চল রে ভাই কালীদহের কূল

মাকে আন্‌তে চল রে ভাই ক্ষীর নদীর কূল
মাকে আন্‌তে—
গলায় দিব চাঁদমালা চরণে জবা ফুল।
মাকে আন্‌তে।

আমরা সবশেষে আলোচনা করব 'গর্ভবতী জননী' নাটকটি নিয়ে। জীবন মৃত্যুর দোলায় দোলায়িত এক অদ্ভুত নাটক 'গর্ভবতী জননী।' এই নাটকেও গান ব্যবহার করেছেন নাট্যকার। এই নাটকটির পাত্র পাত্রীরাও এসেছে বেদে সমাজ থেকে। এদের জীবিকা অর্জন হয় জলা জঙ্গল থেকে নানারকম শাক পাতা তুলে এনে বাজারে বিক্রি করে। হতদরিদ্র মানুষ এরা। নুন আনতে পান্তা ফুরোয় কিন্তু এদের প্রাণেও গান আসে। রাত জেগে এরা পালাগান করে, যাত্রা করে। এই যাত্রার আসরেই এই নাটকের প্রথম গানটি শুনি বনবিবির কণ্ঠে। তাঁর গানে তিনি জানাচ্ছেন ভক্ত সন্তান ডাকলে তিনি না এসে থাকতে পারেন না,—

ডাকলে পরে এমনি করে
ভুলে থাকি কীসের ছলে
মা ডাকে মোর প্রাণ কেড়ে নেয়
না জানি কার পাগল ছেলে।

যাত্রায় আর একটি গান গেয়েছে বিবেক। অন্যায়ের সাথে যুদ্ধের জন্য বুক বাঁধতে বলেছে গরিব অথচ সাহসী ছেলেদের,—

মাভৈঃ রাণী স্মরণ করে বাঁধরে বুক সব গরিব ছেলে
রক্তরাঙা পতাকা তোর উড়াল দেরে মহীতলে।

এদিকে বেদে সমাজের সুধন্যর স্ত্রী কালী গর্ভবতী। তার গর্ভাবস্থায় দশ মাস পড়েছে। লোকাচারের অঙ্গস্বরূপ মেয়েরা কালীকে নিয়ে জল সয়ে এসে গান জুড়েছে, বেদে সমাজের আরাধ্য দেবী মনসা তথা পদ্মাদেবীকে নিয়ে তারা গান গেয়েছে,—

মত্ত হাতির খেলা কর পদ্মের বনেতে
স্বপ্ন দেখি দিব্য হাতি উমার উদরে
মহাদেবের মহা আশয় পদ্মেরি বনেতে
পদ্মের শোভা নাভিমূলে অনন্ত শয়ানে।

বেদে সমাজের জোয়ান ছেলে কম্ব মহাজনের কর্জ মেটানোর জন্য জলায় গিয়েছিল পদ্মফুল, পদ্মমুতো সংগ্রহ করতে। সেখানে তাকে কাল অর্থাৎ সাপে কেটেছে। সে সংবাদ এসে পৌঁছয় গ্রামে। এদিকে কালীর প্রসব বেদনা ওঠে। কালীর ঝোপড়ার চারপাশে ঘুরে ঘুরে মেয়েরা গান গায়। কৃষ্ণের জন্ম হচ্ছে এবার কংসের দমন হবে সেই আশায় গান,—

কংস মরিল গা মারিল কংসারি—
ক্ষীরসায়রে সভা করে যত দেবগণে
একটা ইচ্ছা জন্ম নিল দেবকী উদরে
কংস মরিল গা মারিল কংসারি
কালো ধলো দুই চুলের কৃষ্ণবনমালী
কংস মরিল গা মারিল কংসারি–

কালীর সাথে তার সন্তানের নাড়ির বন্ধন কাটার জন্য বাঁশির চেটি চাইলো দাইমা। জন্মালেও লাগে বাঁশের চেটি, মরে গেলে এই বাঁশের চড়েই শেষ যাত্রা আবার জীবন - মৃত্যুর কিনারে বসে সেই তিনি এই বাঁশের বাঁশি তো বাজিয়ে চলেছেন যুগ যুগান্তর ধরে, বেদেরা গায়,—

জনমে বাঁশের চেটি মৃত্যুকালে চৌদোলা
যেথায় বাজে বাঁশের বাঁশি সেথায় জানি রয় কালা

এই গানটি বারবার ঘুরে ফিরে গায় বেদেরা, কালীর বাচ্চা হয় কিন্তু মৃত বাচ্চা। কালীও অজ্ঞান। বেদেসমাজের নিয়ম মেনে ওঝা আসে ঝাড়ফুঁক করতে। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না কালীর জ্ঞান ফিরল না। মারা গেল সেও। হাহাকার করে বেদে সমাজ গান গাইল,—

জনমে বাঁশের চেটি কালাকালে চৌদোলা
আশয় বিষয় মনশোভা রাত হল আজ সক্কালে।

এভাবেই নাটকে গান ব্যবহার করেছেন নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য। যে লোকায়ত জীবন তাঁর নাটকের মুখ্য উপজীব্য সে জীবনকে তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন বলে জেনেছেন জীবন - ভালোবাসায় - সুখ - দুঃখে - মৃত্যুতে ও মানুষগুলো গানকে আঁকড়ে থাকে, গানের ভেতর দিয়ে উজাড় করে দেয় নিজেদেরকে। সেই গানই তিনি চিরস্থায়ী করে গিয়েছেন তাঁর নাটকে। মাটির নির্যাসমাখা সেই সব গান শুধু বাংলা নাটকেরই নয় সমগ্র বাংলাসাহিত্য তথা লোকসংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ।

সূত্র : বিশিষ্ট বিজন (মনফকিরা ০৬)
নাটক নবান্ন, জীয়নকন্যা, মরাচাঁদ, দেবীগর্জন।